Retail Price Rs. 5/-

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তি-পত্র

৪৮ বর্ষ ❀ জুন ❀ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সংখ্যা ❀ ২০১১ ❀ ১১শ সংখ্যা

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীসুভদ্রাদেবী ও শ্রীবলরাম

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@cal3.vsnl.net.in
visit us : www.gaudiyamission.com
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির, ৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর,
মেদিনীপুর (পূর্ব) মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯০০২৫৯৭৫৯৬
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃ বঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা ফোন-224057 STD-06782
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-
211006 (ইউ. পি.) ফোন ঃ-2500925 STD-0532
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৯৭৬০২৭৭৮৭৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016 ফোন-26868743 STD-011
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118 ফোন-291709 STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163 ফোন-244-484 STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ -9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। শ্রী গৌড়ীয় মঠ, রিহাবাড়ী (মিলনপুর),
গুয়াহাটী-৮, ফোন ঃ 0361-2732049
৩৬। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৭। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	২০৩
২।	শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত	শ্রীল প্রভুপাদ	২০৪
৩।	হরিকথা-প্রসঙ্গ	শ্রীল আচার্য্যদেব	২০৫
৪।	ভগবান বন্ধু, সখা, প্রাণ—এই দিব্য...	শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ	২০৭
৫।	ঠগ দুই	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	২১০
৬।	শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা	শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ (মঠাধ্যক্ষ, গয়া)	২১২
৭।	শ্রীনীলাচল-প্রসঙ্গ	দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ হইতে সংগৃহীত	২১৫
৮।	ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা	... ...	২১৮

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তিপত্র

''ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন ।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥''
— শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

''ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥''
— শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৪৮ বর্ষ ❀ জুন ❀ শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সংখ্যা ❀ ২০১১ ❀ ১১শ সংখ্যা

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা

জীবতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

জীব ব্রহ্মের ভেদ নিত্য-সিদ্ধ কেন?

''দুগ্ধের সহিত জল মিলিত করিলে অপরে তাহাতে ভেদ দেখিতে পায় না। কিন্তু হংস উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ ক্ষীরকে নীর হইতে পৃথক্ করে, তদ্রূপ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে যে—সকল জীব প্রলয়কালে পরতত্ত্বে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হন, ভক্তসকল গুরুবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক সদ্য সেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখাইয়া দিতে পারেন।''

—*তঃ মৃঃ ৮২*

জীব ও ঈশ্বরে একাকার হয় না কেন?

''দুগ্ধে দুগ্ধ মিলাইলে এবং জলে জল মিলাইলে মিশ্রিত হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে ঐক্য হয় না; কেন না, মিলিত দুই বস্তুর পরিমাণ কম হয় না, সেই প্রকার ধ্যানযোগে জীব-সকল পরম পুরুষে বিলীন হইয়াও ঐক্য প্রাপ্ত হয় না,—এরূপ বিমলমতি পণ্ডিত-সকল বলিয়া থাকেন।''

—*তঃ মৃঃ ৮৩*

ভাগ্যবান্ ও দুর্ভাগার লক্ষণ কি?

''যে-কালে ঈশ্বর যেই কৃপা বিতরয়।
ভাগ্যবান্ জন তাহে বড় সুখী হয় ॥
দুর্ভাগা-লক্ষণ এই জান সর্ব্বজন।
নিজ-বুদ্ধি 'বড়' বলি' করয়ে গণন ॥''

—*নঃ মাঃ, ১ম অঃ*

দেহাসক্তি পরিত্যাজ্য কেন?

"The flesh is not our own alas !
The mortal frame a chain;—
The soul confined for former wrongs
Should try to rise again !!"

—*'Saragrahi Vaishnava'*

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন—দেহ এবং মনের কথা আলোচনায় সময় নষ্ট না করে—দেহ ও মনোরাজ্যের সাহিত্যসম্বর্দ্ধনা, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পের গবেষণামন্দিরে সময়াতিপাত না করে যার দেহ ও মন, তার কথা আলোচনা কর—আত্মধর্ম্মের কথায় মনোনিবেশ কর—আত্মার সাহিত্য, আত্ম-পরমাত্মবিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পের কথা অনুক্ষণ আলোচনা কর; তা হলে মানবজাতির সব সুবিধা হয়ে যাবে। যেটা আমাদের মনে ভাল লাগবে, সেটাতেই যে অবশ্যাম্ভাবিরূপে আমাদের মঙ্গল হবে, তা নয়। এ সংসারের বিচার হতে কে উঠতে পারেন? যিনি নিজের অনুষ্ঠিত দুর্দ্দশা ভোগ করতে করতে তাতে ভগবানের অনুকম্পা দর্শন করতে পারেন—যিনি বিচার করেন,—"আমি তৃতীয় মানের জিনিসের আংশিক জ্ঞাতা হলেও চতুর্থ মানের কথা জানি না"—**যিনি তৃতীয় মানের অভিজ্ঞতা-প্রণালীকে বহুমানন না করে তুরীয়রাজ্যের কথা অনুক্ষণ সাধুর নিকট শ্রবণ করেন—যিনি শ্রৌতপন্থা গ্রহণ করেন, তিনিই মঙ্গল লাভ করতে পারেন।** যাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারপ্রণালীর আলোচনা করেন, তাঁরা তৃণের ন্যায় সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু এবং অমানি মানদ হয়ে শ্রৌতপ্রণালী মতে অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের সেবা করেন।

ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর বস্তু। যাঁরা ইতরব্যোমের শব্দের বাহাদুরী নিয়ে 'ভবানীভর্ত্তা' হবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করছেন, তাদের বিরুদ্ধমতিকৃতদোষ মহাপ্রভু দেখিয়েছেন। যেসকল ব্যক্তির সৌভাগ্য হয়, তাঁরাই এসকল কথা বুঝতে পারেন; যাঁরা ভাগ্যহীন, তারা কথা শ্রবণ করছে মনে করলে, প্রকৃত প্রস্তাবে শুনলো না—বঞ্চিত হলো। আমরা আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যদি ভজনীয় বস্তুর সেবা করবার জন্য প্রবৃত্তি বিশিষ্ট হই, তাহলে আমাদের কানে কথা যাবে—আমরা কথা শুনতে পারব। যার যে অবস্থা সে অবস্থা হতে উন্নত হতে হবে, ভাল হতে হবে। যম ছাড়বে না—গায়ে বিষ মাখলে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে দৈবী মায়া ভগবদ্‌বিমুখতার রাজ্যে উপস্থিত করাচ্ছে। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকবে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হয়ে আমাদিগকে আক্রমণ করবে। যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রকৃত সাধুর কাছে হরিকথা না শুনব—নিষ্কপটে সাধুর সেবা না করব, সেই সেই মুহূর্ত্তটুকুর সুযোগ পেয়েই মায়া আমাদিগকে গ্রাস করবে। **পশুর যে বৃত্তি, তার সঙ্গে যারা মানুষের বৃত্তিকে সমান মনে করে চেতনতার বৃত্তিকে হারিয়ে ফেলেছে, তারা নির্গুণ হরিকথা শুনতে পারে না।** অতএব আমাদের কর্ত্তব্য কোথায় হরিকথা হচ্ছে সত্যি সত্যি চেতন থেকে চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হচ্ছে, সেইদিকে মনোযোগ রাখা। জগতে অনুস্বার-বিসর্গ নিয়ে মাথা ও জিহ্বার কসরৎ করার লক্ষ লক্ষ দল আছে; পরব্যোম হতে আবির্ভূত চেতনময় শব্দের তাৎপর্য্য তাদের উপলব্ধি হবে না; তারা হরিকথা বলতে পারে না, তাদের কথা গ্রামোফোনের গানের মত। তারা বিষয়েই ডুবে যাবে—সত্যের উপলব্ধি হবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার করেন আমাদের যেন বাস্তবিক মঙ্গল হয় এবং সে মঙ্গল হতে যেন কোন দিন বঞ্চিত হতে না হয়। জড় জগতে যত কিছু বস্তু আছে, সেইসকল বস্তু তাদের বিপরীত ধর্ম্ম উদয় করবে—পাণ্ডিত্য, 'মূর্খতা' আনবে—সুখ-দুঃখ আনবে—দুঃখ-সুখ আনবে ইত্যাদি।

আংশিক উপমা দ্বারা বুঝাতে গেলে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ও অনভিজ্ঞ বালকের জ্যোতির্ম্মণ্ডল দর্শনে যেরূপ পরস্পর পার্থক্য, অতীন্দ্রিয় বৈজ্ঞানিকের দর্শনের সহিত আরোহবাদী অবৈজ্ঞানিকের দর্শনেও তেমনি পার্থক্য রয়েছে। আমাদের সময় বা অসময়োপযোগী প্রস্তাবসমূহ আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রিয়তা-অপ্রিয়তামূলেই উত্থিত। যেটি, আমাদের মঙ্গলকর হবে, সেরূপ প্রস্তাব অপেক্ষা আমাদের আপাত প্রিয়ঙ্কর অবস্থাই আমাদের নিকট অধিকতর সময়োপযোগী বা দেশকালপাত্রোপযোগী বলে বিবেচিত হয়। আমরা মনে করি, অর্থসংগ্রহ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন; কিন্তু প্রকৃত অর্থ কি, কোন অর্থে আমার সর্ব্বপ্রয়োজন সিদ্ধ হবে, সে বিষয়ে বিচারের সুষ্ঠুতা আমাদের নেই। কোন সময় আমরা মনে করি, বৃদ্ধবয়সে ধর্ম্মের আলোচনা করব, প্রৌঢ় বা যৌবন কাল ধর্ম্মালোচনার সময় নহে; কখনও মনে করি, বর্ত্তমানকালে অন্নসমস্যা

অকালমৃত্যু হতে রক্ষা পাওয়াই আগে উচিত, পরবর্ত্তী সময় ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করা যাবে। কিন্তু এ সকল কেবল প্রস্তাবমাত্র। এরূপ কোটি কোটি অন্নসমস্যা, কোটি কোটিবার অকালমৃত্যু হতে অনায়াসে রক্ষা করতে পারে যে বাস্তব শ্রেয়ঃ, সে বিষয়ে বিচার আমাদের নিকট ততদূর রুচিকর হয় না। আমরা ধর্ম্মকর্ম্ম ও শ্রেয়ঃকে এমন একটা মনে করে রেখেছি যে 'ধর্ম্ম' জিনিসটি আমাদের 'নূতন কিছু কর' নীতির বিপরীত। 'ধর্ম্ম' বল্‌তে আমাদের মনগড়া কতকগুলি ব্যবহার পরম্পরাকেই আমরা 'ধর্ম্ম' কল্পনা করে প্রকৃত 'ধর্ম্ম' কল্পনা করে প্রকৃত 'ধর্ম্ম' হতে দূরে সরে যাচ্ছি।

কোন ব্যক্তির পূর্ব্বে সদুদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে তার আবার অসদুদ্দেশ্য হলো কেন? সে নির্গুণ হরিকথাতে সময় দেয় নাই, কিংবা শুনবার ছল করে অন্যমনস্ক হয়েছে; সে আপাত প্রয়োজনীয় সুখের চেষ্টা হতে বিরত হতে আদৌ চেষ্টা করেনি, অসৎ লোকের পরামর্শ গ্রহণ করে ইন্দ্রিয় সুখের জন্য ব্যস্ত হয়েছে। ভগবানের পাদপদ্ম যদি আশ্রয় করি, তাতে লেখাপড়া শিখি বা না শিখি, বল থাকুক, আর নাই থাকুক, কিছুতেই অসুবিধা নাই, জীব যে নির্গুণ বস্তু; জীব যখন নিজেকে বদ্ধ মনে করে, তখনই তার সগুণ জগতের প্রতি আসক্তি হয়। ভগবানের দাস-সমূহ মানবগণের উপকারের জন্য ইহজগতে আগমন করেন। তাঁদের জগতের কোন কর্ত্তব্য নেই—এ জগতে আসবার কোন আবশ্যকতা নেই—জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্ত্তব্য, ক্ষুধিতকে অন্নদান প্রভৃতি পণ্ডশ্রম হয়ে যায় যদি মূল বিষয় হতে আমরা তফাৎ হই। ভোগরাজ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে জীবকে আকর্ষণ করছে, মায়া টোপ দেখিয়ে আমাদিগকে সর্ব্বদা বিদ্ধ করছে, স্ত্রী-হাতীদ্বারা বনের পুরুষ হাতী বশ করে শৃঙ্খলিত করবার মত মায়া যোষিৎসঙ্গাদির লোভ দেখিয়ে জীবকে সংসারে আবদ্ধ করছে। ❑

হরিকথা প্রসঙ্গ

প্রত্যেক জীবহৃদয়েই ভগবান্ আছেন। ভগবানের কৃপাতেই ভগবান্‌কে হৃদয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কারণার্ণবশায়ী অনন্তব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী, গর্ভোদশায়ী প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী, আর ক্ষীরোদশায়ী প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী। গর্ভোদশায়ী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তরূপে অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক-একরূপে আছেন, আর ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে আছেন। ইনি তৃতীয় পুরুষাবতার ও গুণাবতার উভয়ই। যিনি সর্ব্বত্র আছেন। তাঁহাকে হৃদয়স্থিত অনুভব করিতে পারিলে আর হৃদয়জাত কাম থাকে না। সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শন হওয়া দরকার। ইহাই প্রকৃত সেবাভূমিকা। সেবাবিগ্রহের সহিত সমচিত্ত না হইলে সেবা হয় না। যতক্ষণ আকারদর্শন-দর্শন আছে, ততক্ষণ ভয় আছে। যেখানে আকারদর্শন নাই, সেখানে ভয় নাই। জড়জগতের প্রত্যেক বস্তুই যোষিৎ বা ভোগ্য। তবে ইহা কৃষ্ণের ভোগ্য, জীবের নহে। যেখানে পুরুষাভিমান, সেখানেই আকারদর্শন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম শ্রীনাম আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রকাশ করিতেছেন, ততক্ষণ এই হেয় পুরুষাভিমান যায় না। কামদেবের কামতৃপ্তির জন্য সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা না হইলে প্রাকৃত কাম দূরীভূত হইবে না। দাসাভিমান ব্যতীত যাবতীয় জড়াভিমানই পুরুষাভিমান। আকারদর্শন বা দ্বৈতজ্ঞান গেলে যোষিদ্-দর্শন হইতে ছুটি পাওয়া যাইবে। 'গুরুবর্গ আমার, আমি তাঁহাদের'—এই সম্বন্ধটি দৃঢ় হইলেই মঙ্গল হইবে। তাঁহাদের উপর নির্ভর করিলে সমস্ত সমস্যার মীমাংসা বা সমাধান তাঁহারা করিয়া দিবেন। অকিঞ্চন বা কাঙ্গাল হইলে তাঁহারা অবশ্য কৃপা করিবেন। সম্পূর্ণ শরণাগত হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থাকা প্রয়োজন। তাঁহাদিগকে সব দিতে হইবে, কিছু রাখিয়া দিলে হইবে না। সর্ব্বক্ষণ সম্বন্ধযুক্ত থাকিতে হইবে। যদি সম্বন্ধ ঠিক থাকে, তাহা হইলে আর কোন অসুবিধা হইবে না। যাঁহার জিনিষ, তিনিই রক্ষা করিবেন—

যদি তিনি পান।

ভোগ্যের চিন্তা, ভোগ্যের প্রতি আসক্তি ও ভোগ্যের প্রতি অভিনিবেশই ভয়ের মূল। এই ভোগ্যাশক্তিই দ্বিতীয়া ভিনিবেশ। দ্বিতীয়াভিনিবেশের মূল আবদ্যা বা মায়া। যাঁহার ভোগ্য আছে, তাঁহার ভয় আছেই। যাঁহার সেব্য বা প্রভু আছে, তাঁহার ভয় নাই। 'অভয়ের আমি'র ভয় নাই। অভয়ের প্রতি অভিনিবেশ না হইলে ভয়ের চিন্তা আসে। অভয়াশ্রিত ব্যক্তিই নির্ভয়। ভক্ত অভয়াশ্রিত বলিয়া নির্ভয়; আর সকলেই ভয়াক্রান্ত। যেখানে স্বসুখবাঞ্ছা, সেখানেই ভয়; আর যেখানে কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা, সেখানে অভয়। অভয়ই ভক্তির ফল। যেখানে ভয়, সেখানে ভক্তি নাই। ভক্তিতে ভয় নাই। আশ্রিত ভীত নহেন, নিরাশ্রিতই ভয়গ্রস্ত। 'গুরুর আমি'-অভিমান না হইলে ভয় কিছুতেই যাইবে না। গুরুদেবতাত্মার ভয় নাই। এতদ্ব্যতীত সকলেই অল্পবিস্তর ভীত ও সন্ত্রস্ত। সাধু, গুরু, শাস্ত্র, ভগবান্ ইঁহারা অভয়। ইঁহাদের প্রতি যেখানে বিশ্বাস, সেখানে ভয় থাকিতে পারে না। যেখানে ভয়, সেইখানেই সংশয়; যেখানে সংশয়, সেইখানেই ভয়। সংশয়াত্মা সর্ব্বক্ষণ সন্ত্রস্ত ও ভীত। সংশয়াত্মাকে বিশ্বাস করা যায় না। শরণাগতই বিশ্বাসযোগ্য। সংশয়াত্মা দাম্ভিক। তাহার দাম্ভিকতা বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও সে প্রচ্ছন্ন দাম্ভিক। সংশয়াত্মা বাহিরে আনুগত্যের অভিনয় করে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সে অনুগত নহে। তাহার ষোলআনা মাপিয়া লইবার বুদ্ধি আছে। যাহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকে মুখে অধোক্ষজ বলিয়া অন্তরে তাহা অবিশ্বাস করে, তাহারাই সংশয়াত্মা। সংশয়াত্মা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। সংশয়াত্মার লক্ষণ এই যে, তাহার যত কিছু সংশয়, সমস্তই সাধুগুরু ও তাঁহাদের বাণীর প্রতি। সংশয়াত্মার নিজের প্রতি সংশয় নাই। নিজের প্রতি তাহার খুব বিশ্বাস আছে। নিজেকে সে বদ্ধজীব বলিয়া জানে। বদ্ধজীবের ধারণা প্রাকৃত, দর্শন অসম্পূর্ণ, বদ্ধজীবের বিচার ভ্রমময়—সে সমস্তই স্বীকার করে; কিন্তু স্বীকার করিয়াও নিজের প্রতি তাহার অন্ধবিশ্বাস।

সংশয়াত্মা ও জিজ্ঞাসু এক নহে। জিজ্ঞাসু শরণাগত; সংশয়াত্মা স্বতন্ত্র। জিজ্ঞাসু শরণাগত; সংশয়াত্মা স্বতন্ত্র। জিজ্ঞাসু প্রথমমুখে সাধুগুরুর প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও সে-বিষয়ে তাঁহার অকপট যত্ন ও আত্মধিক্কার আছে। সাধুগুরুর কৃপায় তাঁহার মঙ্গল হইবে—এ বিশ্বাস তাঁহার আছে। সাধুগুরুর সবই ভাল, আমার দর্শনই দোষদুষ্ট—ইহাই তাঁহার বিচার। জিজ্ঞাসু মাপিয়া লইতে চাহেন না। তিনি সাধুগুরুর প্রত্যেক কার্য্যের সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সংশয়াত্মার মাপিয়া লইবার বুদ্ধিই প্রবল। জিজ্ঞাসু কপটী নহে; কিন্তু সংশয়াত্মা কপটী ও কুটিল। জিজ্ঞাসু উন্মুখ। সংশয়াত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সন্দেহবাদী হইয়া যে স্বপ্ন, তাহা পরিপ্রশ্ন নহে। পরিপ্রশ্নের পূর্ব্বে প্রণিপাত এবং পরে সেবা থাকিবে।

ভোগবুদ্ধি বা প্রভুত্ব করিবার বুদ্ধি যাঁহার সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে, তিনিই অকিঞ্চন। অকিঞ্চনতার পূর্ণ বিকশিত অবস্থাই শরণাগতি। আমার কর্ত্তৃত্বাধীন কোন বস্তু আছে এই অভিমান থাকিলে অকিঞ্চনতা থাকে না। 'কৃষ্ণভোগ্য'-অভিমানই অকিঞ্চন ও শরণাগতের লক্ষণ। এই অভিমান যত প্রবল হইবে, তত পুরুষাভিমান কমিয়া যাইবে। ভক্তি হইলে পুরুষাভিমান বা প্রভুঅভিমান নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"জীবের আপনাকে দৃশ্য-অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দ্রষ্টৃ-অভিমানে জগৎকে ভোগ্যজ্ঞান বা ভোক্তৃঅভিমানে অহঙ্কারফলে অমঙ্গল লাভ হয়। জগতের প্রতি সেব্যদৃষ্টিতে অনুপাদেয়তা বা ভোগ্যত্ব দূরে গিয়া সেব্যত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব প্রকটন অর্থাৎ কৃষ্ণসংসার বা গোকুলদর্শনই জীবের নিত্যমঙ্গল ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ। ভোক্তার আপনাকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা অভিমান করা যেরূপ অমঙ্গল, ভোক্তৃ ও দ্রষ্টৃভাবের গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলাইয়া দিয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার আত্মহত্যা ততোঽধিক অমঙ্গলের পথ। একমাত্র পরমভোক্তা ও পরমদ্রষ্টার ভোগ্য ও দৃশ্য হইলেই মঙ্গল।"

পুরুষাভিমানে ভোগ্যজ্ঞানে দর্শনই যোষিদ্দর্শন বা প্রকৃতি-দর্শন। গুরুবুদ্ধিতে দর্শন প্রকৃতি-দর্শন নহে। ভোগপ্রবৃত্তির সহিত দর্শনই স্ত্রীদর্শন, তাহা বাহ্য পুরুষাকার দর্শনেও হইতে পারে। নর ও নারী, পুরুষ ও স্ত্রী—উভয়েই কৃষ্ণশক্তি। এক কৃষ্ণশক্তির আর এক কৃষ্ণশক্তিকে সেবাময়ী গুরুবুদ্ধিতে দর্শনই প্রকৃত দর্শন। যাঁহারা হরিভজনেচ্ছু, তাঁহারা স্ত্রী-দর্শন করিবেন না। ভোগ্য-দর্শনে ভোক্তৃ-অভিমান প্রবল হইলে ভজন হইবে না। ভোগ্যবুদ্ধি হইলে কনক-

যোষিৎ, কামিনী-যোষিৎ ও প্রতিষ্ঠা-যোষিৎ আমার সর্ব্বনাশ করিবে। কৃত্রিম উপায়ে পুরুষাভিমান যাইবে না। সাধুসঙ্গে শ্রীপুরুষোত্তমের ভজন করিতে করিতে প্রকৃতির 'কিঙ্করী' অর্থাৎ কৃষ্ণভোগ্যাভিমানে ইহা দূরে হইবে।

সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে অনর্থ নষ্টপ্রায় হইলে নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা জিনিষটি ঐকান্তিকতা। নিষ্ঠা-অর্থে নৈরন্তর্য্য বা ব্যবধিনরাহিত্য। শরণাগতি থাকিলে একনিষ্ঠ হওয়া যায়। একনিষ্ঠ হওয়া বা সতী-সাধ্বী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণে নিষ্ঠা হইলেই ইতরবস্তুতে নিষ্ঠা থাকে না। নিষ্ঠা হইতেই প্রকৃত বা শুদ্ধভজন আরম্ভ হয়। নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতাই শুদ্ধভক্তির প্রাণ। নিষ্ঠা একাভিমুখী, বহুমুখিতারূপ ব্যভিচার সেখানে নাই। নিষ্ঠা জন্মিলে তখন অবিশ্বাসের অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিবার কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্ত বিচলিত হয় না। নিষ্ঠাবান্ অসৎ পরিত্যাগ করিয়া সতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। নিষ্ঠা ছাড়া মঙ্গল হয় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—'এক' অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ। 'নিষ্ঠা' হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥

"ভগবান বন্ধু, সখা, প্রাণ—এই দিব্যজ্ঞানই সম্বন্ধ জ্ঞান"

শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ

Delhi Seminar, ১৮ই নভেম্বর, ২০১০

পরম আরাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে আমরা প্রার্থনা জানাই যে, কি করে আমরা মহাপ্রভুর কৃপা পাই। মহাপ্রভুর কৃপা পাই মানে যখন আমরা মহাপ্রভুর শিক্ষা, মহাপ্রভুর দীক্ষা, মহাপ্রভুর ভাব যতক্ষণ assimilate করতে না পারি ততক্ষণ তাঁকে এই পাওয়ার কোন অর্থ হয় না। ভগবান গৌরসুন্দর যুগে যুগে অবতীর্ণ হন ভক্তকে সুখ দেবার জন্য। ভক্তকে তিনি সুখ দিতে চান সেজন্য তিনি commission for the purpose । সেটার জন্যই তিনি অবতরণ করেন। ভগবানের যেখানে কার্য্য সাধন করার উদ্দেশ্য থাকে সেখানে তিনি নিজেই আসেন অন্যান্য সেমি ধেমি অবতারকে তিনি প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু সেটাও insufficient হয়, তার জিনিসটা নিজের জিনিসটা impregnated করার যখন উদ্দেশ্য থাকে। জীব যখন স্বরূপত কৃষ্ণ সম্বন্ধ জ্ঞান শূন্য হয়ে, দুঃখের সাগরে ভাসে; তখন আর সে অবস্থায় কেউ রক্ষা করবার থাকে না। তিনি নিজে এসে তার নিজের ধর্মকে পরিপোষণকারী ভক্তগণের কাছে অবদান স্বরূপ রেখে যান। ভক্ত ভগবান ছাড়া থাকতে পারে না আবার ভগবানও ভক্ত ছাড়া থাকতে পারে না, একটা ওতপ্রোত সম্বন্ধ আছে আর এই ওতপ্রোত সম্বন্ধটা সাধনের ফল সাধনের দ্বারা সিদ্ধ হয় সেজন্য আমাদের সবসময় ভগবৎ সম্বন্ধ জ্ঞান নিয়ে থাকতে হবে। আমরা ভগবানের জ্ঞানটা অনেক সময় ভুলে যাই; কিন্তু গৌড়ীয় মিশনের প্রভাব রয়েছে আপনাদের মধ্যে। ভুলে যাওয়াকে বাস্তব উপায়ে স্মরণে আনতে হবে আপনাদের। কাকে স্মরণে আনতে হবে? ভগবৎ স্মৃতি। ভগবান আমার কে, ভগবান আমার বন্ধু, সখা, ভগবান আমার প্রাণ—এই যে ভগবানকে জানার যে প্রবৃত্তি এবং ভগবৎ সম্বন্ধে জানার যে সম্বন্ধ জ্ঞান এই জ্ঞানটা দিব্য। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশ করেছেন—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞান সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥
(ভাঃ ২।৯।৩০)

ভগবান বলছেন যে আমার জ্ঞানটাই হচ্ছে বিজ্ঞান এবং আমার জ্ঞানের দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে আমাকে সে জানতে

পারে। পরমগুহ্য এবং রহস্য সমন্বিত অবস্থায় তাকে অমনি অমনি কেউ পড়ে শুনে বা ভেবেচিন্তে বুঝতে পারবে না। সেজন্য আমাদের ভগবৎ সম্বন্ধ জ্ঞানের দ্বারা লাভ করে ভগবানকে আরাধনা করতে হবে। ভগবানের সম্বন্ধ জ্ঞানটা school, college, university-এর মাধ্যমে আসে না, এটা আসে ভগবানের যে সম্বিত বৃত্তি দ্বারা। সেই সম্বিত বৃত্তির সর্বোত্তম কথা আছে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, পরমাত্মা জিজ্ঞাসা ভগবানের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায়। এই জিজ্ঞাসাগুলো জীবের পরিপূর্ণ হয় কখন, যখন ভগবান্ নিজে স্বয়ং এসে গুরুরূপে ঘরে ঘরে গিয়ে বা কোনপ্রকারে বোঝান, সেইজন্য ভিতরে তিনি স্ফূরণ করান। তিনি বাহিরে অবতার হয়ে আসলেও নিজে যখন আসেন তখন জ্ঞানে নিজের অন্তরে আবির্ভূত হয়ে তাকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এই যে ধর্ম সম্বন্ধ জ্ঞান রহিত যে ধর্ম ভগবানের সঙ্গে এটার একটা formula আছে; এ জাগতিক ধর্মের দ্বারা সম্ভব হয় না। হয় না বলে তাকে ভাগবত ধর্মের মাধ্যমে আনতে হয়। ভাগবত ধর্ম কি? না ভক্ত ভগবানের ধর্ম, যে ধর্মের দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে আমরা ভক্তি পেতে পারি।

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ সদ্যো
হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষনাৎ ॥
(ভাঃ ১।১।২)

এই যে ভাগবত ধর্ম এটা সঞ্জীবিত হয়ে হৃদয়ে ভগবানকে জানায়; ভক্তকে জানায়, ভক্তিকেও জানায়। এই তিনটি হল—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান। ভগবৎ তত্ত্বের মধ্যে এই যে তিনটা epithet বা word রয়েছে যেটা আমাদের সবসময় শ্রবণ পথে রাখতে হয়। 'ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরানাং সতাং' নির্মৎসরার মাধ্যমে প্রোজ্ঝিত ভাগবত ধর্মকে জানা যায় না। 'প্রোজ্ঝিত' মানে যেখানে সমস্ত প্রকার বিরুদ্ধ তত্ত্বপর জ্ঞান শেখানো আছে, যেখানে ধর্মের কোন অপ্রয়োজনীয়তা declare হয়েছে। ধর্ম—ধর্ম বলতে তো আমরা অনেক কিছু কথা বুঝি—দেহধর্ম, মহাধর্ম, যুগধর্ম আর জগতের সবকিছুর মূলে তার একটা ধর্ম বা প্রোজ্ঝিত আছে। কিন্তু এই principle-এর দ্বারা আমরা ভগবানের কথা বুঝতে শিখি না। তথা মহাপ্রভু সেইজন্য বলেছেন—'ধর্ম পরমহি ভগবান বিষ্ণু'। ধর্মের মূল কথা হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর কথা, বিষ্ণু হচ্ছে কৃষ্ণপর তত্ত্ব, কৃষ্ণপরতত্ত্ব হচ্ছেন ভগবান। এখন তিনি ধর্মকে শিখাচ্ছেন জগতে অবতরণ করে সেইজন্য তাহার কথায় কোনপ্রকার কপটতা নেই।

ধর্মটাই মূল বিষয়, principle টা কি? না, এতে ভগবানের যে জ্ঞানটা চর্তুরূপ সেটা—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
(ভাঃ ১।২।৮)

ভগবানের কথায় যদি শত শাস্ত্র পড়েও রতিমুখী না হয় তাহলে সব ব্যর্থ। এই যে ধর্মের মধ্যে সমস্ত জ্ঞান লুকিয়ে আছে সেজন্য পারমার্থিক অনুসন্ধানকারী যারা হবেন তারা মহাপ্রভুকে একেবারে 'দিশাহারা জীবের পক্ষে দিশা' তারা এই principal-ই জানবেন ভগবানের কথা। ভাগবত ধর্ম এইরূপ শিক্ষা দিয়েছেন। ভাগবত ধর্ম থেকে সব জীবের মধ্যে যে ধর্মের আবির্ভাব। ভক্তিধর্ম সেটাকে imbue করে দিয়ে তার থেকে তিনটা কারণ সত্ত্ব, রজ, তম গুণকে আশ্রয় করে আমাদের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়ে থাকে-এগুলো থেকে গুণমুক্ত করা। ভগবান আমাদের এইরকম কৃপালু এবং দয়ালু। তিনি অবতীর্ণ হয়ে আমাদের এই শিক্ষাটা দেন। আমরা এই শিক্ষা পাব কোথায়? শিক্ষা পাওয়ার কোন জায়গা নাই।

তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাম্বরম্
সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥
(ভাঃ ১।৩।৪১)

সমস্ত ধর্মের সার সার শিক্ষা নিয়ে এই ভাগবত ধর্ম। এই ভাগবত ধর্মের principle টা অভিষেক পূর্ণতঃ এবং textproof আর wholesome আর unwholesome সমস্ত ইতর জিনিস ধর্মেতর। ধর্ম আমরা খুঁজি কেন, অধর্মের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। কিন্তু অধর্মের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না জীব, যতক্ষণ না জানে—'ধর্মন্তু ভগবান সাক্ষাৎ ভাগবৎ প্রণীতং'।

ভগবানের কথা জানতে গেলে সমস্ত অনর্থমুক্ত অবস্থায়

ভক্তসঙ্গে থেকে জানতে হবে। চৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীমদ্-ভাগবতের সার কথাকে অর্থাৎ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে জানলেই সব জানা হয়; সেজন্য জানাবার বিধিবিধান নির্ণয় করে তিনি নিজেই 'হা কৃষ্ণ' বলে ক্রন্দন করেছিলেন এবং সেই কাঁদার মধ্যে নৃত্য কীর্তনের মধ্যেই তিনি তার ভাব পুষ্ট করে দিয়ে গিয়েছেন এজগতের ভক্তদের। সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।

সমস্ত শাস্ত্রের নির্যাস থেকে তিনি তুলে দিয়েছেন এবং শুদ্ধ ভক্তি শিক্ষা দিয়েছেন। এই ভক্তিফল আজ জগতে কিছু কিছু বিস্তারিত হয়ে প্রেমফলে পরিণত হয়েছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এই প্রেম জগতে বিতরণ করবেন কি করে কোন্ ভঙ্গিতে? সেজন্য সন্ন্যাস লীলা আবিষ্কার করে তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ের দুয়ার পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। ভগবান যদি সন্ন্যাস না দিতেন, তাহলে প্রত্যেক জীব প্রেম পেত না। ধর্ম বা ধার্মিক জীবনটা যে রকম আমরা স্বাভাবিকভাবে পেতে পারি ভক্তিটাও তেমনি আমরা গ্রহণ করতে পারি যদি আমরা তার শিক্ষায় বা দীক্ষায় প্রলুব্ধ হতে পারি। সেজন্য আমরা 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥' এই ধর্মের জীবন কোথায় আমরা দেখব? শাস্ত্র বলছে—ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং—এ গূঢ় তত্ত্ব। এই মহাজনের পদ অনুলেহন করতে করতে আমরা যতকাল তাদের হৃদয়ের রসবত্তার সঙ্গে পরিচিত হই তখনই এটা সম্ভব। রস একটা অন্য কথা আর ভাগবত শাস্ত্রাদিতে যে জিনিসটা বর্ণন আছে সেটা অন্য কথা। এই রসের রাজ্যটা এই জগতের কথা নয়।

ব্যতীত ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ॥
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫লঃ ৭৯)

ভক্তি শাস্ত্রটা নিরেট রসের থেকে উদ্ভুত হয় সেইজন্য রসের ভূমিকাটা—সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্। এই যে কথা আছে এর নির্মল ভাগবত ধর্মের যেখানে অনুশীলন সেখানে প্রযোজ্য হয়।

আমরা জগতের জীব, নিজ জগতের ধর্মের দ্বারা আবদ্ধ আছি। কিন্তু জগতের এই আবদ্ধতার মধ্যে নিত্যকাল থাকা যায় না আর থাকলে উন্নত সোপানে যাওয়া যায় না। ভগবানের কথা শুনতে গেলে, জানতে গেলে মহাপ্রভুর কথা চিনতে গেলে শিখতে গেলে, কিভাবে তার অনুশীলন করতে হয় সেই ধর্মটা আমাদের ভাগবত ধর্ম, এর দ্বারাই জানা যায়। ভাগবত ধর্ম যেটা ভগবানের ভক্তগণের দ্বারা culture হয়ে থাকে, তাদের দ্বারা cultured হলে তখন তাদের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। মহাপ্রভু জগতে অবতীর্ণ হলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি 'গৃহীজন শিক্ষক ন্যাসিকুল নায়ক' এই ছবিটা দেখাবার জন্য। 'গৃহীজন শিক্ষক', গৃহীজনের শিক্ষক হলেন কি করে? তিনি শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে না উঠতে পারেন সেজন্য তিনি ন্যাসিকুল নায়ক হলেন। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করে তিনি সকলের মধ্যে বিরহের ছবি দিলেন, **এই বিরহের ছবিটাই হচ্ছে প্রকৃতভাবে জীবের নিত্য ধর্ম। নিত্যধর্মের মধ্যে কোন প্রকার কোনকিছুর drawbacks থাকতে পারে না।** সেইজন্য তিনি যুগধর্ম প্রবর্তন করলেন ভগবৎ নাম, ভগবৎ ধাম, ভগবৎ ভক্ত, ভগবৎ সেবা এবং ভগবৎ সঙ্গীর সঙ্গ প্রতি মুহূর্তে তিনি নিজের সঙ্গ দান করলেন। এই নিজের সঙ্গ দান করতে গিয়ে তিনি নিজেই বৈরাগীর ধর্ম নিলেন। বৈরাগীর ধর্ম কি? নিরন্তর ভগবৎ আবেশময় জীবন লাভ করা। তিনি ঘরে থাকুক আর বনে থাকুক, তাতে কিছু কথা আসে যায় না সেজন্য বর্ণাশ্রম ধর্মের পরিপাটীর সঙ্গে যাজন করে তিনি দেখালেন যে ভাগবত ধর্মের আবিষ্কার করে ব্রহ্মণ্য ধর্মে স্থিত থেকে তিনি ব্রহ্মণ্য দেবকে কেমন করে সুখী করতে হয় সেটা আবিষ্কার করে দিয়ে গেছেন এই সন্ন্যাস লীলার মধ্যে।

সন্ন্যাস লীলাটা জীবের স্বরূপের ধর্মে স্থিত হলে হয় আর এটা থেকে বিরূপের ধর্মে হচ্ছে সংসারগ্রস্থ অবস্থা। বিরূপের ধর্মে এটা পাওয়া যায় না, স্বরূপস্থ হলে তখন ওই ধর্মের যাজন করলে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান হয় সেইজন্য আমরা—

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্ন শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন! নহি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥
(ভাঃ ১০।৩৯।২)

লক্ষীপতি যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন তাহলে জগতে আর কোন অভাব থাকে না। আমরা স্বভাবের বশবর্তী হয়ে থাকলে স্বভাবের ফল স্বরূপ স্থিত হয়ে এই স্থিতিঘটার মধ্যে

আমরা ভগবৎ দর্শন লাভ করতে পারি এবং ভগবানের সেবা সৌজন্য লাভ করতে পারি এবং ভগবানের নামের করুণা পেতে পারি ভগবানের ধামের কৃপা লাভ হয়, ভক্তগণের কৃপা লাভ হয় এবং আমরা ভক্তিরাজ্যে এগিয়ে যেতে পারি। এইজন্য চাই বৈকুণ্ঠ ধর্মের অনুশীলন এবং এটা ভগবানের সন্ন্যাস আশ্রমের তাৎপর্য্য। সন্ন্যাস আশ্রমে থেকে তিনি গৃহীজন শিক্ষক এবং ন্যাসিকূল নায়ক। এইজন্য মহাপ্রভু জীবনের অল্প সময়ের মধ্যে তিনি চব্বিশ বছর গৃহস্থ আশ্রম এবং চব্বিশ বছর বৈরাগীর আশ্রম যাপন করে জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন। এটা তার জীবনের বৈশিষ্ট্য। এটা সকলের অনুভাবনীয়, অনুসরণীয় এবং অনুশীলনীয় এবং সকলের এই যে—

আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশস্তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
(শ্রীল শ্রীনাথ চক্রবর্তী)

ভগবানের এই যে অমোঘ স্বরূপ শক্তির বিগ্রহ স্বরূপে আমরা লাভ করতে পারি। সেইজন্য কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা হচ্ছে—এইটা মহাপ্রভুর শিক্ষা এবং তার আচরিত এবং প্রচারিত ধর্মের মূল কথা। আমরা ভক্তসঙ্গে থেকে ভগবানের ধর্ম নিয়ে ভগবানকে আরাধনা করব এবং যত অসুবিধাই হোক না কেন এটাই আমাদের জীবনে তপস্যা করব। Material catastrophy material project প্রভৃতি কল্পনার দ্বারা এরাজ্যে যাওয়া যায় না। সেজন্য জগতে যাদের স্থিতি আছে নিত্য ভূমিকায় সেই ব্যক্তি সেই প্রভু—

আমরা এইভাবে গর্বান্বিত হতে পারি যে মহাপ্রভু যে জায়গায় এসেছিলেন সে জায়গায় মহাপ্রভুর দয়ায় বেঁচে আছি মহাপ্রভুর ডেরায়। মহাপ্রভুর ধর্মে ধর্মী হয়ে আমরা যেন বেঁচে থাকতে পারি।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

—০—

ঠগ দুই

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, (সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

কলিতে ঠগের অন্ত নাই। হাটে-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে, ঘরে-বাহিরে সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এই ঠগের প্রতাপ। ভক্তি রাজ্যও এই বিষয়ে পিছিয়ে নাই। তাই সাধকের কঠিন সমস্যা। যিনি ভজন করিতে চান, ভগবৎ সেবা লাভ বিষয়ে যাহার বড় লোভ তাহার জন্য বহু বিপদ নিরন্তর অপেক্ষা করিতেছে। ঐ সকল বিপদগুলির মধ্যে 'দুই ঠগ' অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান-এর অত্যাচার। ভুক্তিবাঞ্ছা ও মুক্তিবাঞ্ছা সাধকের জীবনে চরম বাধা। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায় ভক্তিসাধকের নিকট এই দুই পরম শত্রু। তাই 'ঠগ' রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিমার্গের পরম গোপনীয় শিক্ষাগুলি তাঁর শিক্ষাষ্টকের মাধ্যমে রাখিয়া গিয়াছেন। উক্ত শিক্ষাষ্টকের পঞ্চম শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই যে,—সংসার সমুদ্রে পতিত জীবের শ্রীকৃষ্ণ কৃপা ব্যতীত উদ্ধারের অন্য কোন পথ নাই। স্বরূপত জীব কৃষ্ণদাস। ইহা ভুলিয়া গিয়া জীবের সংসার ক্লেশ। উক্ত স্বরূপের পুনঃস্থিতি লাভ জীবের পক্ষে কঠিন। একমাত্র নন্দতনুজ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত কখনই সম্ভব নয়। তাই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপ্রার্থী হইয়া নিজেকে কৃষ্ণ পাদপদ্মের ধুলি হইবার আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাদপদ্মে জীবকে স্থান দিতে পারেন যদি ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনের মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করে। উক্ত আকাঙ্খার পুর্ণাপ্তি ভজন

ঠগ দুই

ফলেই সম্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু সংসার বদ্ধজীবের পক্ষে ভজনের পথ কোটি কণ্ঠক দ্বারা রুদ্ধ। তাঁর মধ্যে কর্ম ও জ্ঞান দুই ঠগ জীবের জীবন পথে বসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়—

"জ্ঞান কর্ম ঠগ দুই মোরে প্রতারিয়া লই
অবশেষে ফেলে সিন্ধু জলে।"

ভজন পথে বহুপ্রকার বিঘ্ন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঐসকল অসুবিধার কথা শিক্ষাষ্টকের পাঁচ নং কীর্ত্তনটির মাধ্যমে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁর মতে বিষয়-বিষ, আশা-পাশ, কাম-ক্রোধাদি ছয় বাটপাড় ও জ্ঞান-কর্ম দুই ঠগ—এগুলি ভজনের পরম বাধা স্বরূপ হইয়া থাকে। বিষয় ভোগ পিপাসার কোন অন্ত নাই; ভজন হইবে কিরূপে? শত শত আশাপাশে আমাদের মন আবদ্ধ। কৃষ্ণসেবার আশা আমাদের চিত্তে জাগিয়া উঠিল কই? কৃষ্ণসেবা বাসনা ব্যতীত ইতর বাসনায় চিত্ত নিরন্তর আক্রান্ত। তার উপর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ্ ও মাৎসর্য আদি ছয় শত্রু আক্রমণ সহ্য করিয়া ভজন করা খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এরা পথদস্যুর ন্যায় সাধকের ভজন সম্পত্তি বারবার কাড়িয়া লয়। ফলে ভজন বা সেবা লাভ আরও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

গুরু কৃপাবলে উপরোক্ত বাঁধাগুলি অতিক্রম করিয়াও সাধক ত্রাণ পায় না। তখন তার সামনে দুই ঠগের আগমন। 'ঠগ' শব্দে বঞ্চক বা শঠ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সাধককে ভজন সম্পত্তি লাভ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য এই দুয়ের আগমন। এরা সাধককে প্রতারণা করিতে চায়। এদের অন্য কোন কাজ নাই। সংসারে স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বহু ঠগ দেখা যায়। সে তুলনায় ভজন রাজ্যে ঠগ কেবল দুইজন। এদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করা কঠিন সমস্যা বিশেষ। কর্ম বা জ্ঞান যখন ভগবৎ উদ্দেশ্যে সাধিত হয় তখন উহারা ভক্তি রাজ্যের সোপান হইয়া দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে সাধকের সহযোগী হইয়া মিত্রের ন্যায় কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু কর্ম ও জ্ঞান যখন ভুক্তি বা মুক্তির উদ্দেশ্যে সাধিত হয় তখনই উহা সাধকের নিকট বঞ্চক বা প্রতারকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

অতএব দুই ঠগের বঞ্চনা প্রবৃত্তি যেমন সত্য তেমনি সাধকের বঞ্চিত হইবার প্রবণতাও সত্য। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ ঠগ দুয়ের বঞ্চনা বা প্রতারণার বৃত্তির দোষ না দিয়া সাধককে নিজে বঞ্চিত না হইবার চেষ্টা করা অনেক ভাল। আমি ভোগ ও ত্যাগের লালসা হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিব, উহাদের পাল্লায় পড়িব না এবং উহাদের প্রদত্ত প্রলোভনে কখনই বিচলিত হইব না—এইরূপ মনোভাব দৃঢ় করাই সাধকের উচিত। উহা না করিয়া দুই ঠগের দোষ বা ত্রুটি খুঁজিয়া বেড়াইলে সাধকের ক্ষতি বই লাভ নাই। বরং ঐ দুয়ের খোঁচা যাইয়া সাধক নিজ ভজনে মন দৃঢ়ভাবে লাগাইতে পারে—উহাই উচিত।

সেক্ষেত্রে ভরসা একটাই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাষায়—"কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত"। অর্থাৎ কৃপার দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন—এই প্রার্থনাই সম্বল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"এহেন সময়ের বন্ধু তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু
কৃপা করি তোল মোরে বলে।"

সাধকের জীবনে কৃষ্ণেচ্ছায় এমন পরিস্থিতি আসিয়া উপস্থিত হয় যে, উপরোক্ত যে কোন বাধা প্রবল চাপ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে পথচ্যুতি করিবার পরিস্থিতি দান করে সত্য কিন্তু শরণাগত সাধক উহাতে বিচলিত হন না। কৃপা সম্বল করিয়া তিনি গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া ভজনে লাগিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়, শ্রীল গুরুদেব 'করুণাসিন্ধু' এবং বৈষ্ণবগণ 'বাঞ্ছাকল্পতরু'। এই তিনের ভরসায় থাকিয়া যে কোন সাধক মায়া হইতে মুক্ত হইতে পারেন; কৃষ্ণ সেবা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন—এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

—০—

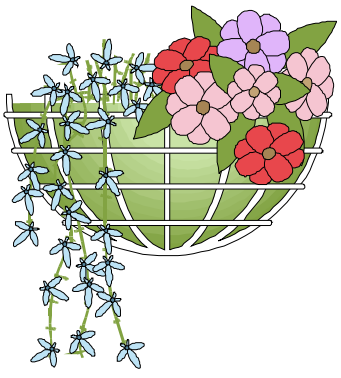

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা

শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ (মঠাধ্যক্ষ, গয়া)

(পূর্ব প্রকাশের পর)...

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত দাসগদাধরের মহিমা শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ কীর্ত্তন করেন, অতঃপর তাঁর সমাধি পীঠে 'নাচে নিত্যানন্দ ভুবন আনন্দ, কীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমান্তে যাত্রীগণসহ বরাহনগর পাটবাড়ী শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য প্রভুর শ্রীপাটে গমন করেন। শ্রীবিগ্রহগণের আরতি বন্দনান্তে বাগবাজার মঠে রাত্রি যাপন করা হয়।

পরিক্রমার চতুর্থ দিবস, একাদশী ব্রত উপবাস। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীগৌরবিনোদানন্দ পীঠকে প্রণাম করে যাত্রীগণসহ পরিচারক মণ্ডলী তারকেশ্বরে রওনা হন। বাবা তারকনাথ স্বয়ম্ভু।

গৌড়ীয়ের মূল মহাজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন শ্রীধাম বৃন্দাবন ধাম বাসের অভিলাষ নিয়ে চলেছিলেন, তখন পথিমধ্যে এই তারকেশ্বরে এক রাত্রি তিনি বিশ্রাম করেছিলেন তখন বাবা রাত্রে স্বপ্ন যোগে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে মায়াপুর ধাম আবিস্কার করবার আজ্ঞা প্রদান করেছিলেন।

বাবার সম্মুখে স্বয়ং গুরুদেব ''তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর'' কীর্ত্তনযোগে আরতি নিরঞ্জন করেন, এরপর বাবা তারকেশ্বরের অনুজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে ভক্তগণ খানাকুল কৃষ্ণনগর শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের শ্রীপাটে গমন করেন। শ্রীবিগ্রহগণের আরতি ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীল গুরুদেব শ্রীল অভিরাম গোপাল ঠাকুরের মহিমা প্রসঙ্গে বহু কথা বলেন।

সেখান থেকে যাত্রীগণ পুনরায় তারকেশ্বরের একটি ধর্মশালায় রাত্রিবাস করেন। রাত্রে শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

গৌড় মণ্ডল পরিক্রমার পঞ্চম দিবস, যাত্রীগণসহ পরিক্রমা পার্টি তারকেশ্বর থেকে কুলীন গ্রামে রওনা হন, এই দিব্যগ্রামে সত্যরাজ খান, গুণরাজ খান আদি মহান ব্যক্তিগণের আবাসভূমি, এই দিব্যগ্রাম সম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভু বলেছেন—

প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে কুক্কুর।
সেও মোর প্রিয়, অন্যজন রহে দূর ॥

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর এখানে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করেছিলেন।

এই গ্রামে আসতে যাত্রীগণের প্রখর রৌদ্রের তাপে শারীরিক ক্লেশ কিছু হলেও দিব্যগ্রামের মাধুর্য্য সকলের চিত্তকে হরণ করেছে। স্থানের মহিমা শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ কীর্ত্তন করেন।

কুলিন গ্রাম হয়ে যাত্রীগণ বর্ধমান নিবাসী শ্রীযুক্ত অরুণ সাধূ ও শ্রীমতী গীতা সাধূর ব্যবস্থাপনায় তাদের গৃহে রাত্রি যাপন করেন। রাত্রে সন্ধ্যারতি পাঠ কীর্ত্তনের পর শ্রী সিদ্ধান্তী মহারাজ ও শ্রীপাদ অকিঞ্চন মহারাজ হরিকথা পরিবেশন করেন। শ্রীপাদ অকিঞ্চন মহারাজ সাধূ সঙ্গে গৌড় মণ্ডল পরিক্রমার শ্রেষ্ঠত্ব ও একাদশী মাহাত্ম কীর্ত্তন করেন।

গৌড় মণ্ডল পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবস, পানিহাটী শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ডমহোৎসবের স্থান, গঙ্গার তীরে অপূর্ব সৌন্দর্য্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর উপবেশনস্থল এখনও বিরাজমান। গুরুপাদপদ্ম ''জীবের ভাগ্যে অবনী আইলা গৌরহরি'' কীর্ত্তন সহযোগে আরোহী নিবেদন করলেন। শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ মহিমা কীর্ত্তন করেন। এখান থেকেই শ্রীরাঘব ভবন। অল্প দূরে, শ্রীল গুরুদেব হেঁটে হেঁটেই গেলেন। মহাপ্রভুর নৃত্যস্থলী, শ্রীমন্দিরে শ্রীল রঘুনাথ দাসের সেবিত শ্রীমুর্ত্তিও রয়েছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জম্বিরের বৃক্ষে কদম্ব পুষ্পের মাল্য পরিধানের মালা এই খানেই হয়েছিল।

যাত্রীগণ রাঘব ভবন থেকে আসেন খড়দহে, শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর লীলাস্থলী শ্রীশ্যামসুন্দর জীউর শ্রীমন্দির, শ্রীজাহ্নবা মাতার পদাঙ্কপুত স্থান।

এখান থেকে যাত্রীগণ হালিশহর শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদের আবির্ভাবস্থলীতে গমন করেন, শ্রীচৈতন্য ডোবা এখনও বর্তমান। এরপর চাকদহ গৌড়ীয় মঠে যাত্রীগণ রাত্রিবাস

করেন। মঠের মহারাজগণ, ব্রহ্মচারীবৃন্দের সহিত গৃহীভক্তগণ পরিক্রমাকারীগনকে অপর্যাপ্ত আপ্যায়ন করেছেন, শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

চাকদহ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট। পণ্ডিত ঠাকুরের সেবিত শ্রীজগন্নাথ জী বিরাজমান রয়েছেন।

পরিক্রমার সপ্তম দিবসে গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে যাত্রীগণ প্রথমেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলীতে উপনিত হন। নদীয়ার বীরনগরস্থিত উলাগ্রাম। দাদু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তাফী ছিলেন বিশাল জমিদার, তাঁর রাজেশ্বর্য্যে তথা সুরম্য বাড়ীটি দেখবার জন্য দুর দুরান্ত থেকে লোক আসতেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ গৌরজন। তাঁর মহিমা গৌর সুন্দরই করতে পারেন। তাঁর সেবিত রাধামাধব জীউকে শ্রীল গুরুদেব ''যশোমতী নন্দন'' কীর্ত্তন দ্বারা আরতী নিরঞ্জন করেন এবং আবির্ভাব স্থলীতে ''জয় জয় গৌরকৃপাসিন্ধু'' কীর্ত্তন দ্বারা নিরাজিত করেন,

শতের শকে আঠারই ভাদ্র,
জন্মিলেন প্রভু প্রেমে ধরা করি আর্দ্র ॥

শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজের মহিমা কীর্ত্তনের পর যাত্রীগণ হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী ফুলিয়াতে গমন করেন।

সেখান থেকে গৌর আনা ঠাকুর শ্রীমদ্ অদ্বৈত আচার্য্যের শ্রীপাট শ্রীশান্তিপুরে উপনিত হন, শান্তিপুর নাথের মহিমা কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ শ্রীনৃসিংহ পল্লী দর্শন করে শ্রীগোদ্রুম ধামে শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে রাত্রি যাপন করেন।

পরিক্রমার অষ্টম দিবস, শ্রীগোদ্রম বিহারীর শ্রীচরণে দণ্ডবৎপ্রণাম ও কৃপা প্রার্থনা করে যাত্রীগণ গুরুপাদপদ্মে অনুগমনে কালনায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাটে গমন করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন হয়ে যাওয়ায় এবার গৌড়মণ্ডল পরিক্রমায় তাঁর উদ্দেশ্যে কেবল প্রণাম করা হল। একই ভাবে কালনা হতে শ্রীখণ্ড যাওয়ায় পথে মামগাছি স্মরণ করে প্রণাম নিবেদন করা হয়।

কালনা নিবাসী শ্রীশম্ভুনাথ আগরওয়ালা যাত্রীগণের বালভোগের ব্যবস্থা করেছিলেন শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের অনুপ্রেরণায়।

শ্রীখণ্ড শ্রীনরহরি সরকার, শ্রীমুকুন্দ দাস ও শ্রী মাধব দাস তিন ভাই মহাপ্রভুর প্রিয়জন। রঘুনন্দনের গোপীনাথের সেবা আজও সর্ব্বজন বিদিত।

পাশেই ভক্তগণের প্রেমকেলীর স্থান, তো শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল চরণস্থলী। এখান থেকে যাজীগ্রাম শ্রীনিবাস প্রভুর শ্রীপাট হয়ে কাটোয়া যাওয়া হয়। কাটোয়া মহাপ্রভুর সন্ন্যাসস্থলী। কেশবভারতীর সমাধি-পীঠ। কাটোয়াতে (মাধাইতলা) যাত্রীগণ রাত্রিবাস করেন।

পরিক্রমার নবম দিবসে কাটোয়া থেকে গাম্ভীলা তথা বুধুরীর পথে মুর্শিদাবাদের একটি দিঘার পাড়ে বসে প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়, খুব সুন্দর খোলা পরিবেশে সকলের খুব ভালো লেগেছিল।

গাম্ভীলা (জিয়াগঞ্জ) নরোত্তম ঠাকুরের প্রিয়শিষ্য গঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট, এখানে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সেবিত শ্রীমহাপ্রভু রয়েছেন এবং গঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শ্রীরাধা গোবিন্দদেব রয়েছেন, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ এখানে এসেছিলেন, ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে স্মার্ত্তবাদীরা যে নিন্দা করেছিল, তার শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা খণ্ডন এই স্থানেই হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য এবং গঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ গুরুসেবা এইখানেই সংঘটিত হয়েছিল।

এখান থেকে তেলিয়া বুধুরী ভগবানগোলা চিরঞ্জীব সেনের বাড়ী, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ এবং গোবিন্দ কবিরাজ, দুই পুত্র, শ্রীজাহ্নবা মাতা প্রদত্ত শ্রীরাধাশ্যাম রায় শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ কর্ত্তৃক সেবিত হয়েছিলেন, বর্ত্তমানে এখানে বিরাজমান আছেন। এখানে থেকে ফারাক্কায় গিয়ে রাত্রিবাস, ভারত সেবাশ্রমে থাকা হয়েছিল।

পরিক্রমার দশম দিবস, আজ ফারাক্কা থেকে গৌড়ীয়ের দুই সেনাপতি শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীদ্বয়ের শ্রীপাট রামকেলি গ্রামে আসা হল, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সেবিত শ্রীমদন মোহন শ্রীমন্দিরে বিরাজমান, মহাপ্রভুর ইচ্ছা পরিপূরনের জন্য দুই জন ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আরতী, কীর্ত্তন, মহিমা শ্রবণের পর প্রসাদ পাওয়া হয়। মহাপ্রভু শুভাগমন স্মৃতিতে তাঁর শ্রীচরণপীঠ জগৎগুরু

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্থাপন করেছেন।

সেখান থেকে নৌকাঘাট মানিকচকে দুইটি নৌকা ভাড়া করে যাওয়ায় হয় কানাইর নাটশালা, প্রায় দুই ঘন্টা সময় লেগেছিল। সকলেই হরিকীর্ত্তন সহযোগে চলেছিল, খুব আনন্দ হয়েছিল। মহাপ্রভু গয়া থেকে ফিরবার পথে এই কানাইর নাটশালায় এসেছিলেন। এখন ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত। কানাইর নাটশালা থেকে পুনরায় নৌকা যোগে মানিকচক হয়ে ফারাক্কায় ফিরে আসা হয়। ফারাক্কায় ফিরে আসা হয়, ফারাক্কাতে দুইদিনের সম্পূর্ণ খরচ গুরুদেবের শিষ্য শ্রীজগভকতবাবু বহন করেছেন।

পরিক্রমার একাদশ দিবস, ফারাক্কা থেকে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবস্থলী একচক্রাধামে আসা হয়। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটভূমীকে প্রণাম করার সৌভাগ্য বহু বহু জন্মের তপস্যার ফলস্বরূপ। গুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা পূর্বক কতকগুলি কীর্ত্তন করান, মহিমা—ভাষণ শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ।

একচক্রা ধাম থেকে পতন্দা নিবাসী গুরুদেবের শিষ্য শ্রীকৃপাসিন্ধু দাস ব্রহ্মচারীর গৃহে গমন করেন। সন্ধাবেলায় ভাগবত ধর্মসভা হয় ও রাত্রিবাস এই স্থানেই হয়।

পরিক্রমার দ্বাদশ দিবসে ভক্তগণসহ গুরুদেব বক্রেশ্বরে যান। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ পর্যটন লীলায় সর্বপ্রথম বক্রেশ্বরে এসেছিলেন। শ্রীবক্রেশ্বরের নিকট প্রণাম ও কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করে মা অন্নপূর্ণার নিকট শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত ''আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে'' কীর্ত্তনটি করে প্রার্থনা জানানো হয়। পাশেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিশ্রাম স্থলী প্রণাম করেন যাত্রীগণ।

শ্রীজয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাটে (কেন্দুবিল্ব) গমন করেন। শ্রীল জয়দেব গোস্বামীর সেবিত শ্রীরাধা-মাধব জীউর শ্রীমন্দিরে আরতী বন্দনা পূর্ব্বক একটি স্থানে বসে তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করা হয়।

জয়দেব থেকে ভক্তগণ আসানসোল নিবাসী শ্রীসোম-নাথ গড়াই মহাশয়ের বাসভবনে গমন করেন। বৈষ্ণব সম্মেলনীর আয়োজন করা হয়েছিল। ভদ্রলোক খুব উৎসাহের সঙ্গে গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবা করেছেন।

পরিক্রমার ত্রয়োদশ দিবসে বিষ্ণুপুর বীরহাম্বীরের দেশে গমন করেন, রাস্তায় অল্প সময়ের মধ্যে বাঁকুড়া নিবাসী শ্রীবিশ্বম্ভর প্রভু অনেক প্রকার প্রসাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীনিবাস প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত শ্রীবীর হাম্বীরের কৃষ্ণ ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুপুর। তার পুত্রদ্বয়েরও কৃষ্ণানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপুর থেকে গোপীবল্লভপুর শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শ্রীপাটে যাওয়া হয়, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর সেবিত শ্রীরাধা-গোবিন্দজীউর অপূর্ব রূপ মাধুর্য্য রাত্রে পাঠ কীর্ত্তন ও মহিমা শ্রবণ করা হয়। নিকটেই সুবর্ণরেখা নদী প্রবাহিতা ভক্তগণ অনেকে স্নান করেন। প্রাচীন নির্মানের এখনও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। ভক্তগণ সমবেত ভাবে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার এইটিই শেষ রাত্রি। পরিক্রমার আনন্দে এতদিন যেভাবে কেটেছে, নিজ নিজ স্থানে ফিরে যেতে হবে, এর কথা স্মরণ করেই মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। শ্যামানন্দ প্রভু তথা রসিকানন্দ প্রভুর দয়ার কথা স্মরণ করে ভক্তগণ তাঁদের শ্রীচরণে অনন্ত দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করে কেবল কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করেন।

আজ গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার চতুর্দশ তথা সমাপ্তি দিবস। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর চরণে প্রণাম জানিয়ে বাসে করে রওনা হন—মেদিনীপুর জেলার তমলুকে শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের শ্রীপাট, মহাপ্রভুর প্রিয় কীর্ত্তনীয়া ইনি, এনার তিন ভাই, সঙ্গীত রসিক ও মহাপ্রভুর প্রিয় গায়ক। তাঁর সেবিত শ্রীবিগ্রহগণ অতি অপূর্ব মাধুর্য্যে মণ্ডিত সেই গৌর, সেই কৃষ্ণ, সেই জগন্নাথ, কীর্ত্তনের সাথে সাথে তার সেবা প্রকাশও অপূর্ব ছন্দ রচনা করেছেন।

সমাপ্তি উৎসব মঠে আশ্রিতা

যজন করে গুরুবর্গের কৃপা ভাজন হয়েছেন। সেখান থেকে সকলেই কলিকাতার দিকে রওনা হন। কেউ কেউ যেমন বেশীর ভাগ উড়িষ্যাবাসী মাঝপথে নেমে স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যান। ২৪ পরগনা যাত্রীও শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে বাড়ী যান। বাকী অন্য যাত্রী কলিকাতা এসে পরিক্রমা সমাপ্তি শ্রীবিনোদানন্দজীউর শ্রীচরণে নিবেদন করেন।

জয় জয় গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা কি!

গৌড়ীয় গুরুবর্গ কি!

অনন্তকোটী বৈষ্ণববৃন্দ কি!

—০—

শ্রীনীলাচল-প্রসঙ্গ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ হইতে সংগৃহীত

দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেব যেখানে নিত্যকাল বাস করেন, তাহাই শ্রীক্ষেত্র বা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীভগবান্ নিয়ত বাস করিয়া থাকেন। এই শ্রীধাম সৃষ্টি বা প্রলয়দ্বারা আক্রান্ত হন না। সত্যযুগে পরমসত্যবাদী বিদ্বান্, বিষ্ণুভক্ত প্রজাপালক, বৈষ্ণবসেবাতৎপর, অশেষ মহাসদগুণ-বিভূষিত শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক পরমভাগবত রাজর্ষি মালবদেশের অন্তর্গত অবন্তীপুরের অধীশ্বররূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন আদিগুরু শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীনারদের কৃপাভিষেকে বিশেষ অনুগৃহীত ছিলেন। মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীনারদের আনুগত্যে শ্রীজগন্নাথদেবের লুপ্তসেবা পুনরায় প্রকট ও সেবার সৌষ্ঠবকল্পে-শ্রীমন্দির ও প্রসাদাদি নির্ম্মাণ করেন। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের পূর্ব্বে নীলাচল পতি শ্রীপুরুষোত্তম 'নীলমাধব' নামেও আখ্যাত ছিলেন।

প্রপঞ্চে এই স্থান ভুবনমঙ্গল-অবতার। এখানে নিদ্রায় সমাধির ফল হয়, শয়নে প্রণামের ফল হয়, ভ্রমণে প্রদক্ষিণের ফল পাওয়া যায় এবং কথায় স্তব হয়; এই ক্ষেত্রের এমনই নির্ম্মল প্রভাব! এখানে যমকিঙ্করগণের অধিকার নাই। এখানে শ্রীজগন্নাথদেবই স্বয়ং সকল জীবের ভাল-মন্দ বিচার করিয়া থাকেন। এই পুরীর প্রভাবে ইহার চতুর্দ্দিকে দশযোজন-পরিমিত ভূমিতে যত পশু কীট ও কৃমি বাস করে, দেবতাগণ তাহাদিগকেও চতুর্ভুজরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীজগন্নাথদেব স্বয়ম্ভু। বৈকুণ্ঠাবতার শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম ...-দারুময় অর্চ্চাবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মার কৃপাভিষিক্ত ভাগবতবর শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নকে বহু বৈষ্ণবজনসমক্ষে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে নৃপ শ্রেষ্ঠ! তুমি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম অনুরাগবশতঃ আমার প্রীতির জন্য রাজ, ঐশ্বর্য্য, প্রজা প্রভৃতি যাবতীয় ভোগোপকরণ ত্যাগ করিয়াছিলে, আমি তোমার সেই অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া তোমার নিকট আবির্ভূত হইয়াছি এবং তোমাকে আমার প্রতি পরম-পাবনী ভক্তি বরস্বরূপে প্রদান করিতেছি। আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, এই প্রাসাদ ভূমিসাৎ হইলেও আমি কদাচ এই স্থান পরিত্যাগ করিব না। অতএব, তুমি আমার নির্দ্দেশমত আমার পূজার সুব্যবস্থা কর। ইহাতে তোমার ভক্তি অবিচলিতা এবং তোমার বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা অপ্রতিহতা হইয়া অনন্তকাল জগতে বিরাজিত থাকিবে। আমি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় অবতীর্ণ হইয়াছি; সুতরাং ঐ দিবস আমার পবিত্র জন্মদিন। সেই দিন আমার মহাস্নান ও পূজাদি করিয়া পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত আমার শ্রীমন্দির বন্ধ রাখিবে। পুনরায় আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে আমার শয়ন, শ্রাবনী পূর্ণিমাতে বারোৎসব, ভাদ্র শুক্লা একাদশীতে আমার পার্শ্বপরিবর্ত্তন, কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীতে আমার উত্থান, অগ্রহায়ণী শুক্লা ষষ্ঠীতে শৃঙ্গার, পৌষী পূর্ণিমাতে পূষ্যাভিষেক, উত্তরায়ণ মকর-সংক্রান্তিতে মাঘোৎসব, ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে হিন্দলোৎসব, চৈত্রী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে দমকার্পণ এবং বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় চন্দনযাত্রা-মহামহোৎসবের যথারীতি অনুষ্ঠান করিবে।"

" বৈশাখস্যাসিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিকা।
তত্র মাং লেপয়েদ্ গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্ ॥"

(স্কন্দপুরাণ)

অর্থাৎ বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়া নাম্নী তিথিতে সুগন্ধিচন্দনদ্বারা আমার অঙ্গ লেপন করিবে।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীকমলনয়ন ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীকমলনয়নের লীলাস্থল। এই শ্রীক্ষেত্রে মদীয় অভীষ্টদেব গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থান। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র আমাদের প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণক্ষেত্র। শ্রীপুরুষোত্তম নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের আচার প্রচারক্ষেত্র।

অক্ষয়তৃতীয়া হইতে জ্যৈষ্ঠী শুক্লা অষ্টমী পর্য্যন্ত শ্রীপুরুষোত্তমদেবের চন্দনযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যহ শ্রীপুরুষোত্তমদেবের বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনকে শ্রীমন্দির হইতে বিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে আনয়ন করা হয়। শ্রীমদনমোহনদেব নীলাচলের প্রসিদ্ধ

মলয়জচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া স্বীয় মন্ত্রী লোকনাথ মহাদেবের সহিত ঐ কয়েক দিবস এই শ্রীনরেন্দ্র সরোবরে নৌকাবিহার করেন। নরেন্দ্র-সরোবরকে শ্রীচন্দনসরোবরও বলে।

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম জগদীশের স্নানযাত্রা মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে শ্রীজগদীশ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রাদেবী স্নানবেদীতে 'পহাণ্ডি'-বিজয় করেন। রত্নবেদীতে সুদর্শন সহিত শ্রীবিগ্রহত্রয়ের অষ্টোত্তরশত সুবর্ণকুম্ভপূর্ণ শীতল সলিলে মহাস্নান হইয়া থাকে। স্নানানন্তর ভগবান্ রত্নবেদীতে গণেশরূপ ধারণ করেন।

যে স্থানে নীলাম্বুধির কল্লোলমালা অবিশ্রান্ত 'জয় জগদীশ' বলিয়া উদ্গান গাহিয়া নৃত্য করিতেছে, যে স্থান নব নব তৃণরাজির হরিদ্বর্ণে সুরঞ্জিত, যে স্থান দক্ষিণ অনিলস্য স্পর্শে সুশীতল, যে স্থান বিচিত্র তরুরাজির শোভায় বিভূষিত, সেইরূপ সুপরিষ্কৃত প্রদেশে শ্রীজগদীশের স্নানপীঠ রচিত হইয়াছে। সমুদয় ব্রহ্মর্ষি, সমুদয় দেবতা জগদীশকে মহাস্নান করাইবার জন্য পারিজাত-সুবাসিত সুরতরঙ্গিণীর পূতসলিল শিরে বহন করিয়া ব্রহ্মার সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করেন এবং ব্রহ্মার আনুগত্যে মঞ্চস্থ শ্রীভগবান্‌কে স্নপিত ও 'জয়'-শব্দ-পূর্ণ বিচিত্র স্তুতিবাদদ্বারা বন্দনা করিয়া থাকেন। দেবতাগণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে বিরাজিত হইয়া শ্রীভগবানের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে স্নানযাত্রাকালে মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন স্নানবেদীর পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহ চন্দ্রাতপশোভিত ও মহামরক-তমণিখচিত সুবিস্তৃত আবরণ-বস্ত্র-দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেন। ঐ স্নানবেদী জীর্ণ হইয়া যাইবার পর মহারাজ অনঙ্গভীম বর্ত্তমান স্নানবেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

স্নানযাত্রা-দিবসে শ্রীজগদীশের স্নানমঞ্চ নানাবিধ মণি, মুক্তা, মাল্য, চামর, পতাকা ও তোরণাদির দ্বারা বিমণ্ডিত, চন্দনসংমিশ্র সুগন্ধ ও সুশীতল পবিত্র জলদ্বারা সংসিক্ত এবং সুগন্ধি ধূপগন্ধদ্বারা সুরভিত করা হয়। তৎপরে জগদীশের সেবকগণ দক্ষিণ-দিগ্‌বর্ত্তী কূপ হইতে স্নানীয় জল উত্তোলন-পূর্ব্বক সেই জল সুগন্ধদ্রব্যে সুবাসিত করিয়া 'পাবমানী'-মন্ত্রের কীর্ত্তন করিতে করিতে সুবর্ণকলসসমূহ পরিপূর্ণ করেন এবং শাস্ত্রোক্তবিধানানুসারে মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবানের অধিবাস করিয়া থাকেন। অনন্তর হোলিদানপূর্ব্বক শ্রীজগদীশকে শ্রীবলরাম, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীসুদর্শনের সহিত স্নানমঞ্চে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হন।

রাজার নিকট সম্মান ও সমাদরপ্রাপ্ত সেবকগণ চামর ও তালবৃন্তের দ্বারা ভগবানের পহাণ্ডিকালে বীজন করিতে থাকেন। শ্রীজগদীশের স্নানবেদীতে গমনকালে যখন রত্নখচিত ছত্র-নিচয় উত্তোলিত, কালাগুরুগন্ধে দিঙ্মণ্ডল অমোদিত, নানাবিধ গম্ভীর বাদ্যধ্বনিতে স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যবিবর পরিপূরিত এবং দীপ-মালিকার আলোকে অন্ধকার বিদূরিত হয়, যখন জগদীশের চতুর্দ্দিকে চামরব্যজন ও মধুর নৃত্যগীতাদি হইতে থাকে, সেই সময় কোন্ সেবোন্মুখের না মানস মহোৎসব-সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে? শ্রীজগদীশকে যিনি বিশুদ্ধচিত্তের রত্নবেদীতে নিত্যস্নান করাইতে পারেন, তিনিই শ্রীবসুদেব। সেই শ্রীবসুদেবের রত্নবেদীতে নিত্যস্নানযাত্রা মহোৎসব হয়। যাঁহারা সেইভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান।

শ্রীজগদীশকে স্নানমঞ্চে বিজয় করাইবার কালে অনবধানতাপ্রযুক্ত পাছে কোনপ্রকার দোষ ঘটে—এই আশঙ্কায় সেবকগণ সুন্দর পট্টবস্ত্রাদিদ্বারা শ্রীপতির সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে দূরবর্ত্তী স্নানমঞ্চে লইয়া যান। তৎকালে অখিল জগৎপূজনীয় শ্রীজগদীশকে 'দূরগমন-নিমিত্ত উত্তানাস্য' করিয়া লইয়া যাইতে হয় বলিয়া স্বর্গস্থিত দেবগণ মনে মনে বিচার করিয়া থাকেন, শ্রীজগদীশ বোধ হয় স্বর্গধামে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন''। এই বিবেচনা করিয়া দেবতাগণ শ্রীপতির দিকে দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক ''হে রাম, হে কৃষ্ণ, আপনাদের জয় হউক! জয় হউক!'' বলিতে থাকেন। এইরূপ লীলাসহকারে রত্নদেবীতে ভগবানের বিজয় অভিষেক হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ জগদীশ বলিয়াছেন—স্বায়ম্ভুব মনুর সত্যাদি চতুর্যুগান্বিত দ্বিতীয় অংশে এবং সত্যযুগের ভগবদ্দর্শনপ্রদ এই প্রথমাংশে স্বায়ম্ভুব মনুর যজ্ঞ প্রভাবেই তাঁহার আবির্ভাব। তিনি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইজন্য ঐ দিবসই শ্রীজগদীশের পুণ্যজন্মদিন। তাঁহারই আজ্ঞামতে ঐ দিবস অধিবাসপুরঃসর মহাস্নান-বিধানানুসারে

মহাসমারোহে রত্নবেদীর উপর তাঁহার স্নানবিধি অনুষ্ঠিত হয়।

মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন এইরূপ বিধানে শ্রীজগদীশ-জন্মতিথি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা মহোৎসব করিতেন। শ্রীজগদীশ মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিয়াছিলেন—"সিন্ধুকুলে যে অক্ষয় বটে আছে, তাহারই উত্তরে সর্ব্বতীর্থময় এক কূপ বিরাজিত রহিয়াছে; কিন্তু উহা এক্ষণে বালুকারাশির দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। স্নানার্থ পূর্ব্বে উহা নির্ম্মাণ করাইয়া পরে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। অতএব সেই কূপ আবিষ্কার করা কর্ত্তব্য। রক্ষক ক্ষেত্রপাল ও দিক্‌পালগণের উদ্দেশে যথাবিধানে বলিপ্রদানপূর্ব্বক শঙ্খ, কাহাল ও মুরজাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত করিয়া চতুর্দ্দশীতে ঐ কূপের সংস্কার করিতে হইবে। দ্বিজগণ স্বর্ণকুম্ভদ্বারা সেই সর্ব্বতীর্থময় কূপ হইতে পূতজল উত্তোলন করিবেন এবং সেই জলদ্বারা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত শ্রীজগদীশ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রার স্নানসেবা করিতে হইবে।" শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি সাক্ষাৎ ভগবানের এই আদেশানুসরণে আজও সেই শ্রীপুরুষোত্তমে এইভাবে স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

স্নানযাত্রা-মহোৎসবের ফলশ্রুতি শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। যাঁহারা শ্রীজগদীশের স্নানযাত্রা নিরীক্ষণ করেন, তঁহাদিগকে পুনরায় জননীর গর্ভোদকে স্নান করিতে হয় না। ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীভগবানের জ্যৈষ্ঠস্নান সন্দর্শন করিলে জীবগণকে কখনই ভবসাগরের বিষবারিতে অবগাহন-স্নান করিতে হয় না। যাঁহারা সেবোন্মুখচিত্তে স্নানযাত্রা দর্শন করেন, যাঁহারা হৃদয়ে স্নানমঞ্চে শ্রীজগদীশকে স্নানসেবা করান, তাঁহারা নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত। মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীজগদীশের আদেশ ছিল যে, এই মহাস্নান করাইয়া পঞ্চদশ দিবস আমাকে অঙ্গরাগহীন বিরূপাবস্থায় কদাচ দর্শন করিবে না।

"ততঃ পঞ্চদশাহানি স্নাপয়িত্বা তু মাং নৃপ।
অচিত্রমবিরূপং বা ন পশ্যেত কদাচন ॥"

শ্রীজগদীশের আজ্ঞানুসারে এই পঞ্চদশ দিবসকাল শ্রীমন্দিরের কপাট বন্ধ থাকে। এই সময় শ্রীভগবানের দর্শন হয় না বলিয়া ইহাকে "অনবসর-কাল" বলা হয়। এই অনবসর কালে বিপ্রলম্ভরসাশ্রিত গৌড়ীয়ভক্তগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের লীলানুসরণে শ্রীআলালনাথদর্শনার্থ গমন করেন।

আষাঢ়মাসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হয়। গোপীগণ কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণকালে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া যেরূপ বিধিধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া যাইতে চাহেন, শ্রীগৌরসুন্দর ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ সেই বিচারেই নীলাচল (কুরুক্ষেত্র) হইতে সুন্দরাচলে (বৃন্দাবন) কৃষ্ণের রথ টানিয়া লইয়া যান। শ্রীজগন্নাথদেব রথযাত্রায় সুন্দরাচল-গুণ্ডিচামন্দিরে গমন করেন। গুণ্ডিচাবাড়ীতে নয় দিন উৎসব হয়। ইহার নাম নবরাত্র-যাত্রা। শ্রীমন্দিরকে যেরূপ নীলাচল বলা হয়, গুণ্ডিচামন্দিরও সেইরূপ সুন্দরাচল নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

"যদ্যপি জগন্নাথ করেন দ্বারকা-বিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার ॥
তথাপি বৎসর-মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিতে তাঁ'র উৎকণ্ঠা অপার ॥
বৃন্দাবন-সম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন ॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা-ছল।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি' নীলাচল ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪।১১৭-১২০)

—০—

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা

প্রথম বিভাগ

১। দশমূলশিক্ষা—

(ক) দশমূলের দশটি শ্লোক কি কি? সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিচারে উহার বিভাগ।
(খ) অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব কি? প্রমাণ ও প্রমেয় কি?
(গ) হরি, জীব সম্বন্ধে কি কি শ্লোক আছে।
(ঘ) অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব বিচার কি?
(ঙ) দশমূলের ফলশ্রুতি কি?

২। ভক্তিবিনোদ গীতি সংগ্রহ—

(ক) কল্যানকল্পতরুর বিশদ বর্ণন।
(খ) শরণাগতির কয়টি কীর্ত্তন, শরনাগতির অঙ্গ এবং ঐ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ।
(গ) প্রত্যেক অঙ্গের কীর্ত্তন কণ্ঠস্থ করা।
(ঘ) যামুনভাবাবলীর কীর্ত্তন কয়েকটি মুখস্থ।
(ঙ) শিক্ষাষ্টক ও নামাষ্টকের কীর্ত্তন মুখস্থ।
(চ) উপদেশামৃত ও মনঃশিক্ষার কীর্ত্তন মুখস্থ।
(ছ) কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার কীর্ত্তন মুখস্থ ও ভক্তিবিনোদ গীতি সংগ্রহ বইয়ের শব্দর্থ ও অনুভাষ্যের ব্যাখ্যা পাঠ করা।

৩। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য— (ক) ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য বই হইতে।

৪। ধামাপরাধ ও নামাপরাধ, বৈষ্ণব অপরাধ ও সেবাপরাধ বিচার।

৫। জয়বন্দনা ও তিলকমন্ত্র ও মহাপ্রসাদ সেবন মন্ত্র আদি।

৬। শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

দ্বিতীয় বিভাগ

১। শ্রীমদ্ভাগবত— (ক) ভাগবতের উৎপত্তি, কিছু শ্লোক মুখস্থ এবং ছোট ছোট উপাখ্যান। (ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অম্বরীশ আদি)

২। শিক্ষাষ্টক— (ক) শিক্ষাষ্টক কার রচনা? শ্লোক মুখস্থ, অর্থ ও তাৎপর্য্য।

৩। নামাষ্টক— (ক) নামাষ্টক কার রচনা? শ্লোক মুখস্থ, অর্থ ও তাৎপর্য্য।

৪। মনঃশিক্ষা— (ক) মনঃশিক্ষা কার রচনা? শ্লোক মুখস্থ, অর্থ ও তাৎপর্য্য।

৫। উপদেশামৃত— (ক) উপদেশামৃত কার রচনা? শ্লোক মুখস্থ, অর্থ ও তাৎপর্য্য।

৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলি মুখস্থ, অর্থ ও তাৎপর্য্য এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়ার।

৭। ভক্তির প্রকারভেদ—শ্রীজীবগোস্বামী, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীল রূপগোস্বামীপাদের মত।, জৈবধর্ম্ম ও অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণ। বিভিন্ন প্রকার ভক্তি ও তার সংজ্ঞা।

বিশেষ সংবাদ

গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ গত ২০।৫।২০১১ তারিখ শুক্রবার রাজ্যের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে তাঁর শপথ গ্রহণের পূর্ব সন্ধ্যায় তাঁর কালিঘাটের বাড়ীতে গিয়ে মাল্যচন্দনাদি দ্বারা আশীর্বাদ প্রদান করেন। এক দৃশ্য সংবাদপত্র 'প্রয়াগ' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

PRAYAG

বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসী ও মহারাজদের নিয়ে রাজ্যের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ জানান। অধ্যক্ষ মহারাজ বলেন, নতুন বাংলা আপনি গড়বেন, এই আশীর্বাদ জানাই। সঙ্গে ছিলেন মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর মহারাজ। —নিজস্ব চিত্র

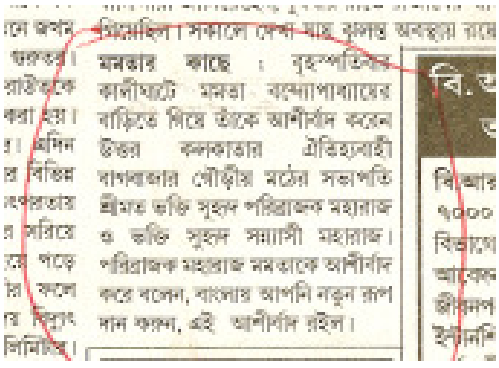

মমতার কাছে : বৃহস্পতিবার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের সভাপতি শ্রীমদ ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজ ও ভক্তি সুহৃদ সন্ন্যাসী মহারাজ। পরিব্রাজক মহারাজ মমতাকে আশীর্বাদ করে বলেন, বাংলায় আপনি নতুন রূপ দান করুন, এই আশীর্বাদ রইল।

সংবাদপত্র প্রতিদিন গত ২০।৫।২০১১ তারিখ শুক্রবারে প্রকাশিত অংশের হরফনামে বাম পাশে উদ্ধৃত হইল।